Downloaded from: justpaste.it/6zkow

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও অন্যান্য

এক ভাইয়ের ফেসবুক টাইমলাইন থেকে নেয়া। সবাই কস্ট হলেও পড়বেন।
গণতন্ত্র, নির্বাচন ও অন্যান্য

স্ট্র-ম্যান আর্গুমেন্ট (Straw man) বলে একটা জিনিস আছে। আপনি আপনার প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সবচেয়ে ফালতু, সবচেয়ে দুর্বল একটা ভারশান বানাবেন। সেটাকেই তার বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরবেন এবং তারপর ইচ্ছেমতো আপনার বানানো সেই ভুলভাল ভারশানের খন্ডন করবেন। ফেইসবুক এবং ইন জেনারেল ইন্টারনেট তর্কবিতর্কে (সাধারণ বিতর্কেও) রেড হেরিং, অ্যাড হমিনেম এবং স্ট্র-ম্যান আর্গুমেন্টের ব্যবহার খুব বেশি। কারণও আছে। এসব করে আসলে তেমন কিছু না বলেই অনেক কিছু বলার ভান করা যায়। প্রতিপক্ষের যুক্তি খন্ডন না করেই খন্ডন করার দাবি করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা জোড়াতালি দিয়ে একরকম তর্কে জেতা যায়। স্ট্র-ম্যান আর্গুমেন্টের উল্টোটাও আছে। স্টিল-ম্যান আর্গুমেন্ট (Steel Man)। আপনি প্রতিপক্ষের আলোচনার সবচেয়ে শক্তিশালী ভারশানকে নেবেন, সেটাকে উপস্থাপন করবেন (সম্ভব হলে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কনফার্ম হয়ে নেবেন আপনি কি ঠিকঠাক তার অবস্থানকে তুলে ধরতে পেরেছেন কি না, নাকি কোন ভুল হয়েছে) এবং তারপর সেটার খন্ডন করবেন। এটার প্রচলন বাংলাদেশে এবং বাংলা ফেইসবুকে মোটামুটি নেই বললেই চলে।
গণতন্ত্র, নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্কও অনেকটা এভাবেই চলছে। কিন্তু যদি আমরা আসলে তর্কবিতর্কের মাধ্যমে কোন গঠনমূলক অবস্থানে পৌছাতে চাই তাহলে আমাদের উচিৎ স্ট্র-ম্যান বাদ দিয়ে স্টিল-ম্যান আর্গুমেন্ট নিয়ে আগানো। কারণ এভাবে নিজের অবস্থানকে তো ভালোভাবে বুঝতে হবেই সেই সাথে প্রতিপক্ষের অবস্থান ও কোন মাইন্ডসেট থেকে তিনি নিজ উপসংহারে পৌছাচ্ছেন সেটাও বোঝা যাবে। এটা করা গেলে অনেকে ক্ষেত্রেই তিক্ততা সম্ভবত এড়িয়ে যাওয়া যাবে।
গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে এই তর্কে ইসলামপন্থীদের মধ্যে মোটাদাগে তিন ধরনের অবস্থান দেখা যায়।
১) যারা গণতন্ত্রকে সম্পূর্নভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। গণতন্ত্রকে শিরক ও কুফরি মনে করেন। প্রায় কোন অবস্থাতেই নির্বাচন করা অথবা ভোট দেয়াকে জায়েজ মনে করেন না।
২) যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে উম্মাহর উত্তরন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা নির্বাচন করা ও ভোট দেয়াকে দায়িত্ব ও ইবাদত মনে করেন।
৩) যারা গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন (অনেকে শর্তসাপেক্ষে মনে করেন)। এই পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে করেন না, তবে বর্তমাণ পরিস্থিতিতে নিরুপায় ও

অপারগতার বলে চিহ্নিত করে একরকম বাধ্য হয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট দেয়াকে জায়েজ বলেন।

এখন যে তর্কটা হচ্ছে সেটা ১ ও ৩ নং দলের মধ্যে। এখানে ১ নং অবস্থানের জায়গা থেকে আমি ৩ নং অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার এবং তাদের মূল প্রশ্নগুলোর (বা দাবিও বলা যায়) জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো। যেহেতু ৩ নং অবস্থানের জায়গা থেকে মোর অর লেস মেনে নেয়া হয় যে গণতন্ত্রকে কুফরি মতবাদ, এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম সম্ভব না, তাই এই আলোচনায় ২ নং অবস্থান সম্পর্কে কিছু আনা হবে না। এবং গণতন্ত্র কুফরি ও শিরক হবার ব্যাপারে আলোচনা আনা হবে না।

এখানে কন্ডেনসড ভাবে কিছু পয়েন্ট শুধু এসেছে। সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা আনা হয়নি। ব্যাখ্যা করা হয়নি। এসব ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে অনেক পাঠকের ভুল বোঝার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়, কিন্তু সময় ও লেখার আকারের দিকে তাকিয়ে এভাবেই লিখতে হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও লেখা ৭৫০০+ শব্দের হয়ে গেছে। এই লেখা কোন অর্থেই পূর্ণাংগ আলোচনা না, বরং অসম্পূর্ণ। কেউ চাইলে এগুলোর ওপর আরো বিল্ড করতে পারেন, এগুলো থেকে আলোচনা আরো বিভিন্ন দিকে নেয়া সম্ভব।

এই লেখার কোন স্বত্ব নেই, যে কেউ ইচ্ছে মতো শেয়ার, ডাউনলোড, প্রচার কিংবা উদ্ধৃতি দিতে পারেন কোন ধরনের ক্রেডিট দেয়া ছাড়াই, তাই এব্যাপারে প্রশ্ন করার দরকার নেই। এক বসায় লেখা হয়েছে, ডাবল চেক করা হয়নি। তাই প্রচুর বানান ভুল থাকার কথা। উপেক্ষা করতে হবে। লেখার অনেক অংশই 'ভুল প্রশ্নের ভুল জবাব' বই (প্রকাশিতব্য) থেকে প্যারাফ্রেইয বা সরাসরি উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এটার পরিমাণ এতোটাই বেশি যে আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হলনা।

লম্বা কিন্তু দরকারী এ ভূমিকার পর মূল আলোচনায় যাওয়া যাক।

মূল বক্তব্য

যারা গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন (অনেকে শর্তসাপেক্ষে মনে করেন)। এই পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে করেন না, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরুপায় ও অপারগতার বলে চিহ্নিত করে একরকম বাধ্য হয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট দেয়াকে জায়েজ বলেন – তাদের মূল দাবিগুলো কী? কোন যুক্তিতে বা কীসের ভিত্তিতে তারা ভোট দেয়া বা নির্বাচনে অংশগ্রহণকে শর্তসাপেক্ষে জায়েজ বলছেন?

এক্ষেত্রে দুটি পয়েন্ট আমরা মাসিক আল-কাউসারের 'নির্বাচন ও ভোট : ইসলামী দৃষ্টিকোণ' (মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যা) লেখা থেকে নিতে পারি।

একটি হল, নিরুপায় হওয়া, অপারগতা, পরিস্থিতির দাবি ইত্যাদি।

যেমন মাসিক আল-কাউসারের এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে,

'...এই গণতন্ত্রই হয়ে গেছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তা যেন ঈমান-আকীদার মতো অপরিহার্য এবং

এর যেন কোনো বিকল্প নেই।'

'...সুতরাং এ ব্যবস্থায় যে শান্তি বা কল্যাণের আশা করা যায় না এবং এ পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান লোকজনের সরকার গঠিত হওয়া যে অনেকটা অসম্ভব তা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। তবুও পশ্চিমা গণতন্ত্র ও নির্বাচনই বর্তমানে আমাদের কাছে তিক্ত বাস্তবতা। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা এখন সে পদ্ধতির অনুসারী।'

দ্বিতীয়টি হল, মন্দের ভালো এবং তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেয়া।

যেমন এই লেখার শেষে 'ভোট অবশ্যই দিতে হবে' শিরোনামের নিচে বলা হয়েছে -

"...মন্দের ভালো বা তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেওয়া এবং অধিক ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। বর্তমানে ভোটকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনায় আনতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে অধিক ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কোনো আসনে একজন লোককেও যদি সাক্ষ্য ও ভোট দেওয়ার উপযুক্ত মনে না হয় তবে তাদের মধ্যে যে জন নীতি-নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা ও কাজে-কর্মে অন্য প্রার্থীর তুলনায় কম খারাপ তাকেই ভোট দিতে হবে। কারো ব্যাপারে যদি খোদাদ্রোহিতা, ইসলাম-দুশমনী, রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থ-বিরোধী হওয়ার সুস্পষ্ট আলামত থাকে তবে ঐ অসৎ ব্যক্তির বিজয় ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে ভোটারাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে।"

এবং

"...মোটকথা, গণতন্ত্র ও বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির যতই ত্রুটি থাকুক এর কারণে ভোট দানে বিরত থাকা সমীচীন হবে না; বরং বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ করে, ভেবে-চিন্তে ভোটারাধিকার প্রয়োগ করতে হবে ভাল-মন্দের ভালো অথবা অন্তত কম মন্দের পক্ষে। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে কাউকে ভোটদানের অর্থ হবে, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, লোকটি তার প্রতিদ্বন্দ্বিদের তুলনায় কিছুটা হলেও ভালো।"

তৃতীয় একটি পয়েন্ট এসেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর একজন নেতার বক্তব্য থেকে যেখানে তিনি বলেছেন, নির্বাচন আর গণতন্ত্র এক না। গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ। কিন্তু নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র না। এই বক্তব্যটি 'চরমোনাই টিভি' নামের একটি মিডিয়ার প্রকাশিত ভিডিও থেকে নেয়া, ভিডিওর লিঙ্কটি আমি এ মূহুর্তে খুঁজে পাচ্ছি না, কেউ পেলে দয়া করে জানাবেন। এই দলটি ছাড়াও এই ধারা অনুসারী আরো অনেকে এই মতটি গ্রহণ করে থাকেন।

এর বাইরে ফেইসবুকে চলা আলোচনা থেকে আরো একটি পয়েন্ট বারবার উঠে এসেছে, সেটা হল 'বাধ্য হয়ে ভোট দেয়ার এই পদ্ধতি যদি বর্জন করা হয়, তাহলে বিকল্প কী হবে?'

তাহলে আমরা মোট চারটি প্রশ্ন বা দাবি দেখতে পাচ্ছি।

১) জরুরত (নিরুপায় হওয়া, অপারগতা, পরিস্থিতির দাবি ইত্যাদি)

২) মন্দের ভালো ও তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেয়ার নীতির প্রয়োগ

৩) নির্বাচন ও গণতন্ত্র এক না। নির্বাচন ক্ষমতায় যাবার পদ্ধতিমাত্র

৪) বিকল্প কী?

এখানে সংক্ষেপে হলেও গণতন্ত্রের বিরোধিতাকারীদের মূল অবস্থান বলে নেয়া দরকার। যারা

গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যানের কথা বলেন তারা বিশ্বাস করেন,

গণতন্ত্র কুফর ও শিরক
গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্*র আইনের শাসনের বদলে মানুষের আইনে শাসন হয়
গণতন্ত্রের মাধ্যমে শুধু আল্লাহ্*র আইনকে বাতিল করা হয় না বরং গায়রুল্লাহ্র আইনের অনুসরণকে আবশ্যিক/বাধ্যতামূলক করা হয়
গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্*র দ্বীনের শাসনকে অস্বীকার করা হয় এবং জনগণের সার্বভৌম মতের শাসনকে আবশ্যিক (অ্যাটলিস্ট ইন থিওরি) করা হয়
গণতন্ত্র একইসাথে পশ্চিমা সেক্যুলার আদর্শনের অংশ এবং বাহন
গণতন্ত্রকে পূর্নাঙ্গভাবে দেখলে এটাই সবচেয়ে অ্যাকুরেট এবং প্রিসাইস কথা হল গণতন্ত্র একটি পৃথক জীবনব্যবস্থা এবং দ্বীন (democracy in its totality is a separate deen)
বর্তমান সময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকগুলোর একটি হল গণতন্ত্র। গণতন্ত্র যদি হুবাল নাও হয়, নিশ্চিতভাবেই লাত-মানাত-উযযার একটা।

এছাড়াও আর অনেক আপত্তি যুক্ত করা যায়, তবে গণতন্ত্রের প্রশ্নে এই অবস্থানের আপত্তির সবচেয়ে গুরুতর কারণগুলো এখানে দেয়া হল। মূলত নির্বাচন ও ভোটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান আসে গণতন্ত্রের ব্যাপারে এই ধারণা থেকে। তবে এসব কিছু সত্ত্বেও এই মতের অনেকেও কিছু শর্তসাপেক্ষে মন্দের ভালো ও তুলনামূলক কম ক্ষতি গ্রহনের নীতির আলোকে ভোট দেয়াকে অত্যন্ত সীমিত কিছু ক্ষেত্রে জায়েজ বলেন। যেমন শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল উলওয়ান হাফিযাহুল্লাহ এর মতে জার্মানি কিংবা ডেনমার্কের মতো দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে বসবাস করা মুসলিমরা এমন ক্ষেত্রে ভোট দিতে পারে যেখানে একজন প্রার্থী চরমভাবে ইসলামবিদ্বেষী এবং অন্যজন অতোটা না। এই ব্যাপারে শায়খের একটা অডিও রেকর্ডীং ইউটিউবে ছিল এখন খুঁজে পাচ্ছি না। পেলে লিঙ্ক যুক্ত করে দেয়া হবে ইন শা আল্লাহ্*। এমন ক্ষেত্রে দুই প্রার্থীর অবস্থানে সিগনিফিক্যান্ট পার্থক্য থাকতে হবে, মুসলিমদের সত্যিকারভাবেই আর কোন উপায় না থাকতে হবে, এরকম বেশ কিছু শর্ত তিনি দিয়েছেন এবং তিনি এটি কাফিরদের দেশে মাইনরিটি হিসেবে বসবাস করা মুসলিমদের ক্ষেত্রে বলেছেন। কাজেই এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে মাসিক আল-কাউসারের বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যেখানে প্রার্থীদের মধ্যে মাত্রার তেমন গুরুতর কোন পার্থক্য নেই সেখানে 'ভোট অবশ্যই দিতে হবে' বলা আর শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল-উলওয়ান এর মত এক না। এবং তাঁর মত অ্যামেরিকা ও ইউরোপে ডেমোক্রেট পার্টি কিংবা অন্যান্য লেফটিস্ট দলগুলোর সাথে কৌশলগত ঐক্য করা ও ক্যাম্পেইন করা মুসলিম সংগঠন ও সেলিব্রিটি আলিমদের মতোও না।
গণতন্ত্র একটি কুফরি ও শিরকি মতবাদ হওয়া, এর মাধ্যমে ইসলাম কায়েম সম্ভব না হওয়া এবং এটি ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা হওয়া নিয়ে দালীলিক যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক প্রমান নিয়ে

সালাফি, আহলে হাদিস, দেওবন্দি এমনকি বেরেলভি মাসলাকের অনেকেই আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেগুলো দেখে নিতে পারেন। যেহেতু এ লেখার উদ্দেশ্য উক্ত অবস্থানের যৌক্তিকতা তুলে ধরা না তাই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া হল না।
আমরা এখন একে একে ওপরে আসা এই চারটি দাবি বা প্রশ্নের ব্যাপারে একে একে আলোচনায় যাবো (এই লেখাকে কোন আলিম, প্রতিষ্ঠান, বা ফতোয়ার খন্ডন বা এই জাতীয় কিছু মনে করা উচিৎ না। সেটা আলিমরাই করবেন ইন শা আল্লাহ্*। এই বক্তব্যগুলোর আলোকে যেসব রেটোরিকাল এবং লজিকাল প্রশ্ন/দাবি তোলা হয় সেগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা মনে করা যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় আলোচ্য বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু চিন্তা শেয়ার করা মনে করলে।) -

জরুরত

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে অপারগতার দোহাই দেয়া হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় যে - ভোট দেয়া ছাড়া অবস্থা পরিবর্তনের আর কোন উপায় নেই। নির্বাচন ও ভোট এখন বাস্তবতা, এই ময়দানও যদি ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। আমরা ভোট না দিলেও নির্বাচন তো হবে।
তাই বাধ্য হয়েই,অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের এখানে অংশগ্রহণ করতে হবে। সেটা জরুরুত, ওজর, রুখসত যেটার ভিত্তিতেই হোক না কেন।
এই দাবিগুলোর ভিত্তিতে আমাদের কিছু দিক নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।
১) জরুরতের এ দর্শন নেয়া হয়েছে শরীয়তের প্রসিদ্ধ মূলনীতি (الضرورات تبيح المحظورات) 'প্রয়োজনের সময় হারাম বস্তুও হালাল হয়ে যায়' থেকে। প্রথমত, এটা বোঝা জরুরী যে ফিকহের এই মূলনীতি (প্রয়োজনের সময় হারামও হালাল হয়ে যায়) অনুযায়ী প্রয়োজনের সময় কোন জিনিসকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়া ঐ জিনিষের মৌলিকভাবে হারাম হওয়াকে প্রমাণ করে। অর্থাৎ এই মূলনীতির ভিত্তিতে যখন কোন জিনিসকে একান্ত প্রয়োজনের কারণে হালাল বলা হয় তখন স্বত্তাগতভাবে সেটা হারামই থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচন কিংবা ভোট দেয়াকে 'জরুরতের' দর্শনের ভিত্তিতে হালাল স্বীকৃতি দিলে এটাও মেনে নিতে হবে যে স্বত্তাগতভাবে সেটা হারাম। (এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে যারা গণতন্ত্রকে কুফর ও শিরক মনে করেন তারা পার্লামেন্টারি ইলেকশনে ভোট দেয়াকে নিছক হারাম মনে করেন না। তাদের অবস্থান অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে এটা কুফর পর্যন্ত যেতে পারে। আর সংসদ নির্বাচন করা তাঁরা মূলত কুফর মনে করেন এবং মনে করেন যে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে এটা কুফরের চেয়ে কম হতে পারে। সুতরাং এই অবস্থান অনুযায়ী এই পুরো আলোচনা শেষ পর্যন্ত অতোটা গুরুত্বপূর্ন না। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা আপাতত তর্কের খাতিরে হারাম ধরে নিয়েই এগোবো।)
কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কি নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোট দেয়াকে হারাম বলে জানে? এই কাজগুলো যে হারাম সেটা জনগণকে জানানোর যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে? ব্যবস্থা

নেয়া হয়েছে? এটা সত্য যে অল্প হলেও গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করা মানুষের সংখ্যা এখন কিছুর শ্রেণীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাড়ছে। কিন্তু এটা কাঁদের দাওয়াহর কারণে? যারা গণতন্ত্রকে কুফরি ও শিরক মনে করেন তাদের দাওয়াহর কারণে এটা হচ্ছে । 'ভোট অবশ্যই দিতে হবে' এটা যতোটুকু জোরের সাথে বলা হচ্ছে, ভোট দেয়া ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ যে হারাম সেটা কি একই রকম জোর দিয়ে বলা হচ্ছে? মসজিদের মিম্বারে, ওয়াজ-মাহফিলে, পত্রিকা কিংবা অন্য কোথাও? এভাবে আংশিক বলা, মুখ্য অংশকে গোপন করে গৌন অংশকে প্রচার করা কি একদম কমে নৈতিক ও আদর্শিক ইনকনসিস্টেন্সি না?

২) একইসাথে আমরা এটাও দেখি যে অনেক ইসলামী রাজনৈতিক দল একদিকে নির্বাচনকে জিহাদ বলে দাবি করেন, কিংবা 'অমুক মার্কায় ভোট দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভোট দেয়া হবে' বলে দাবি করেন, আবার অন্যদিকে একে বৈধ প্রমানের সময় জরুরতের কথা বলেন। এভাবে জরুরতের অজুহাতে দেয়া স্ববিরোধীতা ছাড়া আর কী হতে পারে? একদিকে এটা ইসলামের শিখর জিহাদ, নবীওয়ালা কাজ (যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোট পাবেন!! ইয়াযুবিল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ্* ও তাঁর রাসূল এসব থেকে পবিত্র), অন্যদিকে এটা জরুরতের কারণে বৈধ?

যদি এ কাজগুলো স্বত্তাগতভাবেই জায়েয হয়, কিংবা আরো একটু আগে বেড়ে ইবাদত হয়, অথবা 'আমানত' হয়, অথবা শার'ঈ দায়িত্ব হয় তাহলে 'জরুরত' এর দাবি বলার প্রয়োজন কী? আর যদি সত্যিই তা জরুরতের ভিত্তিতে বৈধ হয় 'আমানত', 'শার'ঈ দায়িত্ব' (কিংবা 'জিহাদ') এসব বলার মানে কী? বরং এটাকে হারাম নির্বাচন বা হারাম ভোট বলা যেতে পারে, যাতে মানুষ ভোট দিলেও অন্তত এটুকু বুঝে যে এই কাজ সত্ত্বাগতভাবে না, বরং একান্ত প্রয়োজনের কারণে বৈধ। এবং সাধারণ মানুষ যেন একে খারাপ মনে করে এর সাথে শুধু অতোটুকুই যুক্ত হয় যতোটুকু না করলেই না। এভাবে অ্যাটলিস্ট মানুষ বুঝবে এই কাজটা হারাম, এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

৩) যদি ধরে নেয়া হয় যে, ভোট ও নির্বাচন আসলেই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে তাহলে জরুরত বা একান্ত প্রয়োজনের সীমা ও সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে ঠিক করা দরকার। দিনশেষে আল্লাহ্*র আইনের বদলে অন্যের আইন দ্বারা শাসন, আল্লাহ্*র আইনকে অকার্যকর করা, মানুষকে আইন প্রণেতা হিসেবে গ্রহণ করা, গায়রুল্লাহর আইন মানতে বাধ্য করা এগুলো ছোটখাটো কোন বিষয় না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, জরুরতে হোক কিংবা গা বাচানোর কারণে হোক নির্বাচনে দাড়ানোর মাধ্যমে ও ভোট দেয়ার মাধ্যমে মানুষ এই ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়ায় অংশ হচ্ছে। যদি এই ধরনের কাজকে আমরা আবারো তর্কের খাতিরে হারাম ধরি তাহলেও এমন গুরুতর হারাম কাজকে বৈধ বানানোর জন্য জরুরতের পরিমাণও মারাত্মক পর্যায়ের হতে হবে (তবে এই কাজ মূলত কুফর ও শিরক। জরুরতের কারণে কুফর ও শিরক জায়েজ হয় কি না তা নিয়ে আলোচনা পড়ে আসবে)। এমন হারাম কোন মাত্রার প্রয়োজনের সময়ে বৈধ হতে পারে ফুকাহায়ে কেরাম সেটা নির্ধারণ করে গেছেন। সেটা হল, 'প্রাণ অথবা অঙ্গহানির আশঙ্কা' (loss of life & limb)। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ভোটারের সংখ্যা ১০ কোটি ৩০

লাখ[1]। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০%। এই ১০ কোটি মানুষ কি প্রান অথবা অঙ্গহানির আশংকায় আছেন যে 'ভোট অবশ্যই দিতে হবে'? আর যদি সত্যিই এমন হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে দেশের ৬০% এর বেশি মানুষের প্রাণ কিংবা অঙ্গহানির আশঙ্কা তৈরি করা সরকারকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ওলামায়ে কেরাম আনুগত্য পাবার অধিকারী দাবি করতে পারেন? আর কিভাবেই তা তাদের জন্য দোয়া করতে পারেন? আর তাদের সাথে এক মঞ্চে বসে প্রশংসায় ভাসাতে পারেন? অথবা এ নিয়ে নিরব থাকতে পারেন?

বাস্তবতা হল ভোট আর নির্বাচনের সাথে অধিকাংশ মানুষের জীবননাশ কিংবা প্রানহানির আশঙ্কা জড়িত নেই। সেক্ষেত্রে এই মূলনীতির আলোকে ঢালাওভাবে বৈধতা দেয়া, ভোট দিতেই হবে এমন বলা কিভাবে শুদ্ধ হয়?

৪) 'জরুরত' এর ভিত্তিতে কোন কিছুকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বৈধতার পরিমাণ বা সীমা ঠিক করা'। ফিকহের মূলনীতি হল, প্রয়োজনের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ বস্তু অতোটুকুই বৈধ হবে যতোটুকু প্রয়োজন। যা বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে বৈধ সেটাকেই মূল চাহিদা কিংবা ন্যায্য মনে করে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যাবে না। জীবন বাঁচানোর জন্য শুকরের গোশত খাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু তার মানে এটা না যে সেই গোশতের টিক্কা, কাবাব, বার্গার, আর সাব-স্যান্ডউইচ বানানো হবে, এসব খাবারের জন্য নতুন নতুন দোকান দেয়া হবে, সেসব দোকান থেকে বিভিন্ন আকর্ষনীয় অফার আসবে আর কিভাবে এগুলো আরো বাড়ানো যায় সেই চিন্তা করা হবে, এবং অন্যদেরও এটা খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হবে?

'জরুরত' এর দর্শন কি এই জন্য যে, এর প্রচার প্রসারের জন্য বড় বড় সমাবেশ করা হবে, শহর ও গ্রামের গুরুত্বপূর্ন পয়েন্টে, টিভি ও পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে আর কোটি কোটি টাকা এর পেছনে ঢালা হবে?

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভোট ও নির্বাচনের ব্যাপারে, এমনকি খোদ গণতন্ত্রের ব্যাপারে মানুষের অবস্থান ওপরের কোন অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়?

৫) আরো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল, 'জরুরত' এর ভিত্তিতে কোন বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য কী? সেই জিনিসকে সাময়িকভাবে মেনে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা। সেটাকে জীবনের আবশ্যিক অংশ বানানো উদ্দেশ্য না। status quo বা বিদ্যমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা উদ্দেশ্য না।

ফিকহের একটি মূলনীতি হল, (ما جاز لعذر بطل بزواله) ওজরের কারণে যেই বস্তু হালাল হয়, ওজর দূর হওয়ার সাথে সাথে তার বৈধতা বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রয়োজনের কারণে কোন হারাম বস্তু বৈধ স্বীকৃতি দেয়ার দাবি হল সেটাকে নিশ্চিহ্ন করা, প্রতিষ্ঠা করা নয়। কারণ 'জরুরত' এর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা অস্থায়ী হওয়া। তো যে ব্যবস্থা ও পরিস্থিতিতে অপারগতা ও নিরুপায় হবার কথা বলে ভোট দেয়াকে আবশ্যিক সাব্যস্ত করা হচ্ছে, সেই পরিস্থিতি দূর করার জন্য কী করা হচ্ছে? দীর্ঘমেয়াদে যেন ভোট দিতে না হয়, গণতন্ত্র থেকে বের হয়ে আসা যায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য কী করা হচ্ছে বা কোন রূপরেখা দেয়া হয়েছে? আমার জানামতে

এমন কোন সুনির্দিষ্ট সমাধান বা রূপরেখা এই মতের অনুসারীরা দেননি। যদি জানায় ভুল থাকে তাহলে সহৃদয় পাঠক শুধরে দেবেন।

আর যদি কেউ বলেন মাদ্রাসাকেন্দ্রিক যে কার্যক্রম আছে সেটাই এই ব্যবস্থা দূর করার পদ্ধতি, তাহলে তার সেই কথা নিশ্চিতভাবেই ভুল। কারণ মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা বের হচ্ছেন তাদের মধ্যে দিন দিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা মানুষের সংখ্যা কমছে, এবং আরো উদারভাবে একে স্বীকৃতি দেয়া মানুষে সংখ্যা বাড়ছে। আর সাধারণ জনগণের মধ্য গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ হবার ব্যাপারে ব্যাপক অজ্ঞতার একটা বড় কারণও এটা। কাজেই পদ্ধতি যদি এটাই হয় তাহলে সেই পদ্ধতি ফেইল করেছে। নতুন পদ্ধতির কথা ভাবা উচিৎ। যেহেতু জরুরতের অজুহাত দিলেও দীর্ঘমেয়াদে এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার কোন চেষ্টা কিংবা প্রস্তাবনাও তাদের কাছ থেকে আসছে না, তাই অ্যাট বেস্ট জরুরতের কারণে ভোট-নির্বাচন বৈধ ও আবশ্যিক হবার ব্যাপারে তাদের এই অবস্থান অসম্পূর্ন, ব্যাপকভাবে ইনকন্সিসটেন্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ।

৬) যদি ধরে নেয়া হয়, ভোট ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ কোন ধরনের রুখসত (অবকাশ, ছাড়) - সেক্ষেত্রে ভাবার বিষয় হল রুখসতের ব্যাপক প্রচলনকে আবশ্যিকভাবে মূল এবং একমাত্র স্ট্র্যাটিজি হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ কি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা থেকে পিছু হটা না? কোন কৌশলী কাজের উদ্দেশ্য কি 'রুখসত' এবং জরুরত' এর ব্যাপক প্রচলন করা? নাকি মূল লক্ষ্যের পথকে সহজ করে তোলা? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জীবন ব্যবস্থা সংস্কারের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নিশ্চিতভাবে এমন একটি মারহালা বা পর্যায় থাকে যেখানে মূল লক্ষ্যের চেয়ে নিচের তথা রুখসতের উপর আমল করতে হয়। কিন্তু রুখসতের উপর আমল করা বৈধ কি না তা নির্ভর করবে এর মাধ্যমে মূল বিষয়ের উপর আমল করা সম্ভব হবার ওপর। যদি রুখসত মূল লক্ষ্যকে সম্ভপর করে তোলার বদলে একে বিলুপ্তই করে দেয় এবং নিজেই মূল লক্ষ্যের স্থান দখল করে নেয়, তখন এই রুখসত তার বৈধতা হারিয়ে ফেলে। কারণ তার স্বত্ত্বাগত কোন বৈধতা নেই। উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জনের মাঝেই এর বৈধতা নিহিত থাকে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভোট-নির্বাচনের বৈধতা দেয়ার সময় উদ্দিষ্ট বিষয় আসলে কী?

অনন্তকাল পর্যন্ত মন্দের ভালো খুঁজে যাওয়া? যদি একথা বলা হয় তাহলে এমন ক্ষেত্রে জরুরত কিংবা রুখসতের অজুহাত আদৌ দেয়া যায় কি না সেই প্রশ্ন আসে। তারচেয়েও বড় আরেকটি প্রশ্ন আসে, যারা এমন অবস্থান গ্রহণ করেন তারা কি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আদৌ কোন অবস্থান নিতে চান নাকি আজীবন এমন অবস্থাতে কোনমতে টিকে থাকতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট?

মন্দের ভালো ও তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেয়ার নীতির প্রয়োগ

ভোট ও নির্বাচনের বৈধতা দেয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি বহুল ব্যবহৃত; সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যুক্তি বা দাবি হল – এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ কারোই কাম্য না, কিন্তু মন্দের ভালো ও

তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকে বেছে নেয়ার জন্য, যুলুম কমানো ইত্যাদি কারণে এতে অংশগ্রহণ করা হয়।
প্রথমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তার বাস্তবতা অনুযায়ী যদি কুফর ও শিরক ধরা হয় তাহলে ভোট ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে মন্দের ভালো –এর নীতির প্রয়োগের জায়গা অত্যন্ত সংকুচীত হয়ে আসে।

*[অনেকে সূরা নাহলের ১০৬ আয়াত ও আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনার কথা বলে দাবি করতে চান যে বলপ্রয়োগের (ইকরাহ – إكراه) কারণে কুফর সাময়িকভাবে বৈধ হয়। আর তাই গণতন্ত্র কুফর হওয়া সত্ত্বেও এই দলিলের আলোকে তা সাময়িকভাবে বৈধ হতে পারে। এই ব্যাপারে লেখার একদম শেষে আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

যদি আমরা তর্কের খাতিরে গণতন্ত্রের কুফর ও শিরক হওয়ার বিষয়টি বাদ দিয়ে চিন্তা করি তবুও এই পদ্ধতিতে আসলেই কি 'মন্দের ভালো' কে গ্রহণ করা হচ্ছে কি না, বাস্তবতা ও তথ্যের আলোকে সেটা স্পষ্ট হয় না।
১) প্রথমে দেখা দরকার আসলে কি এই পদ্ধতি মন্দের ভালো? মন্দের ভালো হিসেবে কেন A দলের বদলে B দলকে বেছে নেয়া হবে সেটা বোঝাতে ইসলামবিরোধী বিভিন্ন পলিসি বাস্তবায়ন, ইসলাম বিরোধিতার প্রসার, ইত্যাদি পয়েন্টের কথা আনা হয়। প্রশ্ন হল এই পলিসিগুলো কি দেশীয় সরকার বানাচ্ছে নাকি বাইরে থেকে এগুলো ঠিক করে দেয়া হচ্ছে আর দেশীয় সরকার (যে সরকারই হোক) সেগুলো বাস্তবায়ন করছে? ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে আইন, পাঠ্যবই ও সিলেবাস, সিডও সনদ, বাকস্বাধীনতার নামে ইসলাম অবমাননার বৈধতা – এরকম বেশিরভাগ পলিসি কিন্তু দেশীয় সরকার বানায় না, বাস্তবায়ন করে মাত্র। এই পলিসিগুলো আসে জাতিসঙ্ঘের মতো বৈশ্বিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে। সমকামিতা বিরোধী আইন বাতিল করার জন্যও জাতিসঙ্ঘ থেকেই বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজেই পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার চাপিয়ে দেয়া এই পলিসিগুলো প্রত্যাখ্যানের মতো মানসিকতা তৈরি হবার আগ পর্যন্ত এই ধরনের ক্ষেত্রে এক সরকার বদলে অন্য সরকার আসলে তেমন কোন পরিবর্তন আসবে না। এই ক্ষেত্রে মন্দের ভালো নীতি প্রয়োগের তেমন একটা সুযোগ নেই।
২) একই কথা প্রযোজ্য সামাজিক অবক্ষয়, যিনা-ফাহিশা-অশ্লীলতা-পর্নোগ্রাফির প্রসার, মাদকের ব্যাপক ব্যবহার, সামাজিক বন্ধনগুলোর ভাঙ্গন – ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন হবে এগুলো কি দেশীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে নাকি এগুলো পশ্চিমা কালচার এবং গ্লোবালাইযেইশানের প্রভাব? যদি এটা গ্লোবালাইযেইশানের প্রভাব হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে সরকার বদলে আপনি এটা থেকে বাঁচতে পারবেন না, এটা থেকে বাঁচার উপায় হল সামস্টিকভাবে র*্যাডিকালি নিজেদের এই জোয়ার থেকে ইনসুলেইট (insulate) করা।
ওপরের দুটি পয়েন্টের মূল বক্তব্য বোঝার জন্য একটা বিষয় বোঝা দরকার। আজকের বিশ্বে

সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও (আমাদের মত দেশগুলোতে সত্যিকার অর্থে অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু গণতন্ত্র আছে বলা যায় না) মূল খেলোয়াড়রা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় না। বরং খেলা নিয়ন্ত্রন করে আঞ্চলিক ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেইশান, বৈশ্বিক ফাইন্যানশিয়াল ও মানি মার্কেটের নেতা, সুশীল সমাজ (যারা সংজ্ঞাগতভাবেই লিবারেল ও সেক্যুলার), মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, গোয়েন্দা সংস্থা, মিডিয়া (যেটা অল্প কয়েকটা কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে), দেশি বিদেশী এনজিও, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি। এরা সবাই হল স্টেইকহোল্ডার যারা পেছন থেকে পলিসি তৈরি করে। আর সামনে থেকে রাজনীতিবিদরা সেগুলো বাস্তবায়ন করে। নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা পরিবর্তনের ব্যাপারটা অনেকটা কাস্টোমারের পছন্দে কোন দোকানের সেইলসম্যানের বদলানোর মতো। এতে বাহ্যিক একটা পরিবর্তন আসে কিন্তু দোকানে আগে যা বিক্রি হচ্ছিল, এখনো সেটাই বিক্রি হয়। সেইলসম্যান ঐ জিনিসগুলোই বিক্রি করে যেগুলো স্টেইকহোল্ডাররা ঠিক করে দেয়। কাস্টোমারের চাহিদা এখানে গুরুত্বপূর্ন না, স্টেইকহোল্ডারের প্রফিট গুরুত্বপূর্ন। সুতরাং বর্তমানে ম্যাচিউরড ডেমোক্রেসিগুলোতেও নির্বাচন হল একটা বাহ্যিক পরিবর্তন মাত্র। ইউরোপ এবং অ্যামেরিকার বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদদের অনেকেই অনেক দিন ধরে এই কথাগুলো বলছেন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্টেইকহোল্ডার কারা? দুর্নীতিগ্রস্থ আমলাতন্ত্র, জুডিশিয়ারি, মিডিয়া (কে কতোটা স্বাধীন, পাঠক ভালো বুঝবেন), আর্মি, দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এবিসিডি এইজেন্সি, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং এ ধরনের অন্যান্য সংস্থা, ভারত, অ্যামেরিকা, এবং জমিদার টাইপের পারিবারিক রাজনীতি করা একটা শ্রেণী – এরা সবাই মিলে ঠিক করে পরের এক মাসে বা এক বছরে এই ভূখন্ডে কী কী বাস্তবায়ন করা হবে। এখানে জনগণের বলার, করার তেমন কিছু নেই। থিওরিতে যাই থাক বর্তমাণ বাস্তবতা হল নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষকে শুধু এই ভুল বুঝটা দেয়া হয় যে 'যা হচ্ছে তা অধিকাংশের ইচ্ছে অনুযায়ীই হচ্ছে'। কিন্তু আসলে যা হচ্ছে তা অধিকাংশের না বরং অভিজাতদের ইচ্ছে অনুযায়ী হচ্ছে। সুতরাং এই বাস্তবতার আলোকে মন্দের ভালো বেছে নেয়ার দাবি অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, কারণ যে পরিবর্তনটা আপনি দেখছেন সেটা কসমেটিক, এসব ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে এই নীতি প্রয়োগের সুযোগই আপনাকে দেয়া হচ্ছে না।

এক্কেবারে সহজ-সরল ভাষায় বললে – A দল বদলে যদি আগামীতে B দল আসে তারা এই স্টেইকহোল্ডারদের সমর্থন নিয়েই আসবে এবং তাদের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করবে। কেউ হয়তো একটু বেশি ভারত ঘেষা হবে কেউ একটু বেশি অ্যামেরিকাঘেষা। কিন্তু ওপরে ১ ও ২ নং পয়েন্টে বলা যুলুম কিংবা মন্দ গুলো প্রতিহত করার ক্ষেত্রে A বা B বা Z দল আসার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৩) অনেকে যুলুম কমানো পদ্ধতি হিসেবে নিরুপায় হয়ে মন্দের ভালো প্রার্থীকে ভোট দেয়ার কথা বলেন। এখানেও দাবিকে আমাদের বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রতি নির্বাচনের পর নেট যুলুমের মাত্রা ও পরিমাণ (ইসলাম ও বাস্তবতার দৃষ্টিকোন থেকে, কোন দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে না) কি কমেছে? বর্তমানে বাংলাদেশে যুলুমের অবস্থা কী এরশাদের

সময়ের চেয়ে ভালো? ক্লিয়ারলি যুলুম কমছে না। নির্বাচনে মন্দের ভালোকে ভোট দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে যুলুম কমানো যাচ্ছে না এটা প্রমাণিত সত্য। ৯২ থেকে ২৬ বছরের দেশীয় ইতিহাস তাই বলে। চাইলে বাইরের ইতিহাসও টানা যায়, তবে সেটার প্রয়োজন নাই। বাস্তবতা হল ভোটের মাধ্যমে যুলুম কমানো যাবে, এটা একটা ধারণা মাত্র এবং ভুল ধারণা। তাত্ত্বিকভাবে এটাকে লজিকাল মনে হলেও বাস্তবে এটার প্রতিফলন দেখা যায় না। নির্বাচনে ভোট দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে নেট যুলুম কমে এটার স্পষ্ট প্রমাণ আনার পর এই দাবিকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। যেমন একজন তালিবুল ইলম ভাই বলেছেন, সিদ্ধান্ত নেয়া হয় প্রত্যাশা, সম্ভাব্যতা আর প্রবল সম্ভাবনার (গালেবে ঘ্বন) ভিত্তিতে। সমস্ত বোধবুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনাবোধ, যুক্তি, এটাই বলে যে নির্বাচনে ভোট দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে যুলুম কমে না। এবং ভবিষ্যতেও কমবে না এই সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনাই প্রবল। তবে কিছু নির্দিষ্ট দলের কিংবা শ্রেণীর মানুষের ওপর যুলুমের পরিমানে তারতম্য হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যদি এই নীতির আলোকে ভোট দেয়াকে বৈধতা দেয়া হয়ও তাহলে তা খাসভাবে নির্দিষ্ট কিছু লোকের জণ্য হলেও হতে পারে, ঢালাওভাবে ভোট দিতেই হবে, এই দাবি এই বাস্তবতা থেকে প্রমাণিত হয় না।

৪) যদি জাতীয় পর্যায়ে আসলেই সত্যিকারের কোন পরিবর্তন আনতে চান তাহলে এমন দলকে ভোট দেয়ার কোন অর্থই নেই যারা সরকার গঠন করতে পারবে না। ভোট দিলে ঐ দলকেই দেয়া উচিৎ যারা সরকার গঠন করে, জাতীয় পর্যায়ে যুলুম কমানোর ক্ষেত্রে চেষ্টা করতে পারবে বা অ্যাটলিস্ট 'মন্দের ভালো' হতে পারবে। সেক্ষেত্রে যতোগুলো কওমি রাজনৈতিক দল আছে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই) সহ, তাদের ভোট দেয়া exercise in futility - অর্থহীন। ভোট যদি আমানত হয় তাহলে সেটা বুঝেশুনেই দেয়া উচিৎ। এমন কাউকে দিয়ে লাভ নেই যে সংসদে গিয়ে তেমন কিছুই করতে পারবে না, কারণ তার যথেষ্ট সিট নাই।

একইসাথে এভাবে দলে দলে বিভক্ত হওয়া, যেটা বাংলাদেশে ইসলামী গণতান্ত্রিক দলগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে হয়েছে (জামায়েত ইসলামী ছাড়া) অর্থহীন এবং কাউন্টার প্রডাক্টিভ। একটা দল থাকা উচিৎ যাতে করে সম্ভাব্য ভোট ও আসনের সংখ্যা বাড়ানো যায় এবং সত্যিকার অর্থে কোন পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা বাড়ানো যায়। এই ধরনের যুক্তি অনুযায়ী মন্দের ভালোর নীতির ওপর আমল করতে গেলে উচিৎ ছিল জামায়েতে ইসলামীকে ভোট দেয়া এবং দিতে বলা অথবা বড় দুটি দলের কোন একটায় যোগ দেয়া।

আর যদি মন্দের ভালোর কথাই বলা হয় তাহলে বিদ্যমান সরকারের মধ্যে ঢুকে কিছু 'ভালো' করার চেষ্টা করতে কী সমস্যা? ৯১ পর্যন্ত 'মন্দের ভালো' এর ওপর আমল কিভাবে হয়েছে? তখন তো গণতন্ত্র ছিল না? তখনো সরকারব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। সুতরাং যে অবস্থা এর আগে আরামসেই কাটিয়ে আসা হয়েছে সেই অবস্থা আবার আসলে 'বিকল্প কী হবে?' এই প্রশ্ন নিয়ে এতো উতলা হবার অর্থ কী?

৫) যুলুম কমানোর মানে কী? যুলুম কমানো মানে তো শুধু যুলুমের বিরোধিতা না, বরং কোন

যুলুমকে থামিয়ে দেয়া। বা নতুন কোন যুলুমের প্রচলন আটকে দেয়া। বাংলাদেশের ৪৭ বছরের ইতিহাস থেকে বলুন ভোটের মাধ্যমে কোন কোন যুলুমগুলো আমরা থামাতে পেরেছি? আমরা তো অনেকদিন ভোট দিয়ে যাচ্ছি। যুলুম কি দিন দিন কমছে নাকি বাড়ছে? গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে পাচ-ছয় দশক আগে দিন দিন ইসলাম ও মুসলিমরা কি শক্তিশালী হয়েছে? সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের প্রভাব কি বেড়েছে? নাকি উল্টোটা হয়েছে? চক্রবৃদ্ধি হারে শুধু মন্দই বেড়েছে? না মন্দ কমেছে, না যুলুম কমেছে, না ইসলামবিরোধিতা কমেছে – তাহলে যে দাবিটা করা হচ্ছে সেটার বাস্তবতা কোথায়?

৬) আসন্ন নির্বাচনে যদি ৬০-৭০% ভোটারও ভোট দিতে পারেন তাহলে ফলাফল কী হবে সেটা মোটামুটিই সবাই জানেন। কিন্তু এটাও মোটামুটি সবাই জানেন যে এই ভোটারদের ভোট দিতে পারার ও অনেকেরই কাঙ্ক্ষিত সেই ফলাফল আসার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। তার মানে শুধু মানুষ ভোট দিতে রাজি হওয়া কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও যুলুম বন্ধের জন্য যথেষ্ট না। সেটার জন্য নুন্যতম একটা লেভেলে পার্টিসিপেটরি ডেমোক্রেসি থাকা লাগবে। যেমন ধরুন সিরিয়াতে নিয়মিত ভোট হয়, হচ্ছে। কিন্তু যুলুম তো থামছে না। কারণ সেখানে ঠিকমতো নির্বাচন হচ্ছে না। সেখানে আসলে গণতন্ত্র নেই। অংশগ্রহনমূলক নির্বাচন নেই। তাহলে এই ফ্রেইমওয়ার্কের মধ্যে মন্দের ভালো পর্যন্ত যেতে হলেও আপনাকে আগে কিছু বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। শুধু ভোট দিতে হবে বলে বসে থাকলে হবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে মন্দের ভালো ঠিক করার জন্যও একটা নূন্যতম পরিমাণ নিয়মতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ গণতন্ত্র লাগবে। সেটা কিভাবে করবেন?

তাহলে কি আগে অংশগ্রহনমূলক সঠিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করা হবে, তারপর সেখানে মন্দের ভালো খোঁজা হবে তারপর আরো একশো বছর পর গিয়ে আপনি চিন্তা করবেন status quo কে বদলে কিভাবে ইসলামী শাসন আনা যায়? যেভাবে অনেক পলিটিকাল ইসলামিস্ট কিংবা ‘গরীবের সুলতান সুলেমান’ এখন করছে? কিন্তু সেটাও তো বলা হচ্ছে না। নাকি আপনি মাঝের অর্থহীন দুটা ধাপ বাদ দিয়ে এবং আরো একশো বছরের অপেক্ষা বাদ দিয়ে সমস্যার মূলে যাবেন?

৮) ভোট ও নির্বাচনের বৈধতা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে এটা 'মন্দের ভালো'। কিন্তু সমস্যা হল, Lesser of two evils - বা মন্দের ভালো নীতির অনুসরনের অবশ্যম্ভাবী রেসাল্ট দীর্ঘ মেয়াদে সমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বে মন্দ বা evil বৃদ্ধি পাওয়া। সিম্পল গেইম থিওরি দিয়ে এটা ম্যাথমেটিকালি প্রমান করা সম্ভব। আমরা যদি সবসময় মন্দের ভালো - কেই বেছে নেয়ার মূলনীতি নেই তাহলে বাই ডেফিনিশান আমরা সবসময় মন্দকে বেছে নিচ্ছি। এতে করে দিনদিন মন্দ বাড়তেই থাকবে। স্পটতই মন্দের ভালো নীতিকে মূল ও স্থায়ী স্ট্র্যাটিজি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এই নীতি প্রয়োগের একটা সীমারেখা থাকতে হবে। এটা জরুরতের মতোই সাময়িকভাবে কৌশল হতে পারে, যার উদ্দেশ্য হবে সাময়িকভাবে এই নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে মন্দের প্রভাবকে দূর করে ভালোকে গ্রহণ করা। কিন্তু এটাই স্থায়ী স্ট্র্যাটিজি হতে পারেনা, কারণ তাহলে সমাজে মন্দ বাড়তেই থাকবে।

সাধারণত সংস্কারমূলক পলিসির ৩টা পর্যায় থাকে
শর্ট রান, মিডল রান আর লং রান।
লং রানে পলিসির ফসল ঘরে তলার চেষ্টা করা হয়।
মিডল রানে নিজেদের চারপাশের পরিস্থিতি ও পরিবেশকে বদলানো চেষ্টা করা হয়।
শর্ট রানে মনোযোগ থাকে তাৎক্ষনিক করণীয় এর দিকে। যেমন এই বছর আমাদের নির্বাচনে ভোট দেয়া উচিৎ কি না? যদি উচিৎ হয়, তাহলে কোন দলকে? আমাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য হরতাল দিতে হবে নাকি অন্য কিছু? ইত্যাদি বিষয়। সাধারনত শর্ট রানে এমন কিছু করা হয় না যাতে নিজেদের নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ বদলে যায়। বরং বিদ্যমান পরিবেশের ভেতর থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিন পর্যায়ের মধ্যে status quo বা বিদ্যমান অবস্থার সাথে সবচেয়ে বেশি আপস এই পর্যায়ে ঘটে। এজন্য এই পর্যায়ে অনেক সময় 'সবচেয়ে অল্প মাত্রার' মন্দকে গ্রহণ করতে হয়। short run-এ এমন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না, যার দরুন long run- এ কাজ করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং সবশেষে কাজ করার অবস্থানই বিলুপ্ত হয়ে যায়। বরং এ পর্যায়ে বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে।
পলিসির এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে ভোট ও নির্বাচনকে শর্ট রানে কিছুটা জাস্টিফাই হয়তো করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে ভোট ও নির্বাচনকে যারা মন্দের ভালোর নীতির আলোকে বৈধতা দিচ্ছেন তাদের Long Run-এর উদ্দেশ্য কী? আর এই শর্ট রান আর কয় দশক চলবে?
দেখুন মন্দের ভালো গ্রহনের নীতির আলোকে প্রায় ছয় দশক ধরে ভোট এবং নির্বাচনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এর ফলাফল হল ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর কমেছে ইসলামবিরোধী পলিসি বেড়েছে, যুলুম বেড়েছে। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পরিস্থিতি আরো কঠিন হয়েছে। ভোট ও নির্বাচনকে বৈধতা দেয়ার এই অবস্থানের সবচেয়ে বড় ও মারাত্বক সমস্যা হল এখানে এমন একটা অর্ধেক সমাধান দেয়া হচ্ছে যেটা সমস্যাকে টিকিয়ে রাখছে, এবং সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করছে। বাস্তবতা হল এই 'সমাধান' কোন সমাধান তো না-ই বরং সমস্যার অংশ। এটা গণতন্ত্রের বাস্তবতা জানা ও অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে, এটা মানুষের মনে গণতন্ত্রকে ঢালাওভাবে বৈধতা তৈরি করছে (কারণ গণতন্ত্র কুফরি হবার কথা স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে না), এবং ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে।
কাজেই তাত্ত্বিকভাবে যদিও মন্দের ভালো ও তুলনামূলক কম খারাপের নীতি গ্রহনের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই পলিসি অনুসরণের ফলে মন্দ বাড়ছে। মুমিন এক গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না, বারবার একই ভুল করে না। কিন্তু স্পষ্ট রেসাল্ট সামনে থাকার পরও দশকের পর দশক একই ধরনের ইলযামী ও মানতেকী কথাবার্তা দিয়ে একটা ভুল টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আরো বড় করা হচ্ছে। এই পলিসি কোনদিনও কাঙ্ক্ষিত ইসলামী শাসন তো আনবেই না, মন্দের ভালোও আনবে না, বরং ক্রমান্বয়ে আমাদের status quo এর সাথে আরো বেশি করে মিশিয়ে দেবে। আমাদের আরো বেশি করে status quo এর সাথে

assimilate করাবে। এই পুরো অ্যাপ্রোচটাই হল বিদ্যমান অবস্থার সাথে fit-in বা মানিয়ে নেয়ার পদ্ধতি। status quo এবং সিস্টেমকে বদলানো এই অ্যাপ্রোচের উদ্দেশ্যও না এবং এর দ্বারা সম্ভবও না, যদিও নিশ্চয় সেই ইচ্ছা এই অ্যাপ্রোচ গ্রহনকারীদের মধ্যে আছে।

নির্বাচন আর গণতন্ত্র এক না। নির্বাচন ক্ষমতায় যাবার পদ্ধতিমাত্র

১) অনেকে এটা বলে থাকেন যে নির্বাচন আর গণতন্ত্র এক না। গণতন্ত্র কুফরি মতাদর্শ কিন্তু নির্বাচন সত্ত্বাগতভাবে কুফরি না। এ কথা সত্য। ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচন, কোন জামাত বা গোষ্ঠীর নেতা নির্বাচনসহ অনেক কিছুই সত্ত্বাগতভাবে কুফর তো না-ই হারামও না। কিন্তু আপাতভাবে সঠিক এ কথার মধ্যে একটা বড়সড় ফাঁকি আছে। সেটা হল এখানে যে নির্বাচনের কথা বলে হচ্ছে, যেই নির্বাচনে ভোট দেয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেটা এই ধরনের নির্দোষ কোন নির্বাচন না। এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের আইনসভার সদস্য, এমপি (MP – যার শাব্দিক অর্থই হল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট/Member of Parliament) নির্ধারনের নির্বাচন। কাজেই যদিও গণতন্ত্র মানেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন না, কিন্তু অবশ্যই জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতন্ত্রের অংশ।

এই নির্বাচনে যারা জিতবে তারাই সংসদে যাবে। আইনসভার সদস্য হবে। সেক্যুলার সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে আইন বানাবে। সেক্যুলার সংবিধান সংরক্ষন ও এ অনুযায়ী শাসনের শপথ করবে। আল্লাহ্*র আইন ব্যাতীত অপর আইন দিয়ে শাসন করবে। আল্লাহ্*র আইনকে অকার্যকর করবে। গায়রুল্লাহ্র আইনের অনুসরণকে বাধ্যতামূলক করবে।

এই নির্বাচনে যারা ভোট দেবে তারা এই কাজগুলোর জন্য একজন লোকের জন্য ভোট দিবে। মাসিক আল-কাউসারের ভাষায় 'সুপারিশ, সাক্ষ্য ও প্রতিনিধিত্বের সনদ' দেবে। মাসিক আল কাউসারের লেখায় উল্লেখিত কুরআনুল করীমের আয়াতের এই তর্জমা অনুযায়ীই ভোটদাতারা এর দায়ভার বহন করবেন।

'যে ভালো সুপারিশ করবে সে তার নেকীর ভাগী হবে। আর যে মন্দ সুপারিশ করবে সেও মন্দের হিস্যা পাবে।' -সূরা নিসা, আয়াত ৮৫

কাজেই নির্বাচন মানে গণতন্ত্র না, একথা এখানে প্রযোজ্য না। কারণ গণতন্ত্রের যে বিষয়গুলো কুফর ও শিরক সেগুলোতে অংশগ্রহনের জন্যই এই নির্বাচন।

২) এমনো দাবি করা হয় যে নির্বাচন শুধু একটি পদ্ধতি। ক্ষমতায় যাবার পদ্ধতি যুগে যুগে এক ছিল। যেমন আবু জাহল যুদ্ধ করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও যুদ্ধ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন হবার কারণে হুকুম বদলে গেছে। এই কথাটার অবস্থাও আগের কথার মতোই, আপাতভাবে ঠিক মনে হলেও ভেতরে সমস্যা আছে।

যেমনটা আমরা বললাম, সংসদ নির্বাচন কোন নির্দোষ প্রক্রিয়া না। এটার উদ্দেশ্যই হল সংসদীয় গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন। এই অর্থে এর সাথে যুদ্ধের তুলনা সঠিক না। কারণ গণতন্ত্রের শিরক ও কুফর কাজগুলোতে অংশগ্রহনের জন্যই সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহন করা হচ্ছে। কারো যদি এই ইচ্ছা নাও থাকে তবুও পার্লামেন্টের সদস্য হতে হলে তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বে এই কুফরের ওপর শপথ নিতে হবে, এবং যেই entity বা body আইন প্রনয়ন, গায়রুল্লাহ্র আইন দিয়ে

শাসন ইত্যাদি করছে, সেটার অংশ হতে হচ্ছে। কাজেই যুদ্ধের সাথে এখানে কিয়াস চলে না। বরং সংসদের জন্য শপথ নেয়ার মিল ঐ অবস্থার সাথে যেখানে দুইজন ব্যক্তি দুর্গা কিংবা হুবালের নামে শপথ নেয় কিন্তু দুইজনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। একজনের অন্তরে শিরক, আরেকজন আল্লাহ্*র ওপর বিশ্বাস করে। আর সংসদের আইন প্রনয়ন, আল্লাহ্*র আইন বাতিল করা ইত্যাদি কাজের অংশ হবার সাদৃশ্য এমন দুই ব্যাক্তির সাথে যেখানে তারা দুজনেই গায়রুল্লাহ্র নামে পশু যবেহ করলো, কিন্তু একজন অন্তরে শিরক নিয়ে করলো আর আরেকজন অন্তরে আল্লাহ্*র ওপর বিশ্বাস নিয়ে করলো। প্রথম কাজের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ (ইকরাহ্) ইত্যাদির অজুহাত দিয়ে হয়তো কুফরি উচ্চারণকে জায়েজ করা যায়, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে কাউকে জোর করে সাংসদ বানানো হচ্ছে না বরং মানুষ জোর করে সংসদে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় কাজ তো কুফর আকবর-ই। কাজেই এভাবে যুদ্ধের ময়দানের সাথে তুলনা সঠিক না।

৩) এই যুক্তিগুলো থেকে এই ধরনের অবস্থান ও চিন্তার মৌলিক একটি সমস্যা বেড়িয়ে আসে। আর সেটা হল সম্পূর্নতা (totality) থেকে ছেড়ে শাখাগত সমস্যার দিকেই শুধু ফোকাস করা। সার্বিক সমস্যার দিকে না তাকিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে নির্দিষ্ট কিছু অংশের দিকে তাকানো। (كل (totality) তথা পুরো বিষয়ের বদলে جز শাখাগত দিকে মনোযোগ দেয়া। সম্পূর্ণকে ছেড়ে আংশিককে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দর্শন ও পদ্ধতিকে totality থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা এবং শাখাগত কিছু সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেই সেগুলোর ভিত্তিতে ইসলাম ও পাশ্চাত্যকে এক করার চেষ্টা করার যার জ্বলন্ত একটি প্রমাণ হলো, গণতন্ত্র-ভোট-নির্বাচনের জন্য এধরনের কথাবার্তা। এনলাইটেনমেন্টের ভিত্তি ওপর গড়ে ওঠা পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ মার্কেট এবং গণতন্ত্র সৃষ্টিই হয়েছে নির্দিষ্ট মতাদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, কিন্তু অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ আজো এগুলোকে শুধু value-neutral প্রয়োগিক প্রক্রিয়া ও কাঠামো (technical operational process and structure) হিসেবে দেখছেন। তারা মনে করেন, এসব প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামো ব্যবহার করে সব ধরনের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব, ইসলামী উদ্দেশ্য অর্জনও সম্ভব। দর্শনগতভাবে এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ কাঠামো এবং উদ্দেশ্যের সম্পর্ক দেহ ও আত্মার মতো। এই ভুল ধারণার কারণে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বৈধ করার জন্য ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ বিচিত্র ধরনের দর্শন আবিষ্কার করছেন। পূজা শিরক কিন্তু পুরোহিত হবার জন্য স্বেচ্ছায় আরো দশজনের সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করা জায়েজ!

৪) যেকোন কিছুর বাস্তবতা নিহিত থাকে তার টোটালিটির মাঝে। যখন এই টোটালিটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে, আলাদাভাবে দেখা হবে, কখন বাস্তবতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কোন নতুন সমস্যাকে যখন তার সম্পূর্ণতা (totality) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হবে, তখন তার আসল রূপই পাল্টে যাবে। ফলে সমস্যার প্রকৃত রূপ অনুধাবন ও সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণতাকে উপেক্ষা করে বিদ্যমান ব্যবস্থায় fit in করার এই নীতির ভিত্তিতেই নিজেদের ১ হাজার বছরের সোনালী ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার বদলে আমরা ইংরেজদেরই দেয়া গণতন্ত্রে অংশ নিচ্ছি। মজার বিষয় হল, স্বাধীনতা

অর্জনের পরও আমরা নিজেদের ঐতিহাসিক অনুশাসনে (যেমন মোঘল বা তুর্কী খিলাফাহ ব্যবস্থা) ফিরে যাইনি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই মেনে নিয়েছি, গ্রহণ করে নিয়েছি, বৈধতা দিয়েছি এবং এটাকেই ইসলামী বানানোর চেষ্টা শুরু করেছি।

৫) যখন সামগ্রিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনুপস্থিত তখন totality কে প্রত্যাখ্যান করে শুধু শাখাগত বিষয়ে ফোকাস করার অর্থ হল মূল সমস্যার সমাধানের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নিছক নবউদ্ভাবিত বিভিন্ন শাখাগত সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকা। ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে এই কর্মপদ্ধতি সঠিক, কিন্তু ইসলামী শাসনের অনুপস্থিতিতে সেক্যুলার ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই একই পদ্ধতি সমূহ বিপদের কারণ। কারণ যেই সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এখন fit in- করার পদ্ধতির সবক দেয়া হচ্ছে, সেই পরিবেশটাই অনৈসলামিক। এমন অবস্থায় fit in- করার নীতি অবলম্বনে অসংখ্য ক্ষতি আছে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল, সমাজ ও রাষ্ট্রে সেক্যুলার ব্যবস্থার প্রভাব ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে আর এর ফলে উলামায়ে কেরামের প্রভাব আরো কমছে, সীমাবদ্ধত ও অপারগতা আরো বাড়ছে।

বাস্তবতা হল 'শাখা' এর বদলে পুরো ব্যবস্থাকে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু বানানোর আগে অবস্থার পরিবর্তন হবে না, দুর্বলতা কমবে না বরং বাড়বে, মন্দও বাড়বে আর পরিস্থিতিও আরো খারাপ হবে, 'অপারগতা ও অপরিহার্যতাও' বেড়েই যাবে।

বিকল্প কী?

নির্বাচন ও ভোটের বৈধতার ব্যাপারে অবস্থানের বিরোধিতা করা হলে অনেকেই প্রশ্ন করেন 'তাহলে বিকল্প কী'? তোমরা কোন বিকল্প দিচ্ছো না, আবার বিরোধিতাও করছো এটা কেমন কথা?

১) প্রথমত একটা কথা বলা দরকার। বর্তমানে পুরো বিশ্ব 'দারুল আমানে পরিণত' হবার এই যুগে ইসলামের এমন অনেক বিধিবিধান আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলা বেআইনি। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যেমন ১৮ বছরের নিচে কারো বিয়ে দেয়া বাংলাদেশের আইনে বেআইনি। কিন্তু এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী?

কাজেই যারা গণতন্ত্রকে বারবার কুফর ও শিরক বলছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে নববী মানহাজকে চিহ্নিত করছেন, ফাতহুল মক্কার কথা বলছেন কিংবা সূরা আনফাল কিংবা সূরা তাওবাহ এর দলীল দিচ্ছেন তখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি বলতে তারা কী বোঝাচ্ছেন সেটা কোন ইসলামপন্থীর না বোঝার কিছু নেই। এটা হতে পারে তারা বিভিন্ন ধরনের অঞ্চলে, বিভিন্ন বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপটের আলোকে কিভাবে এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের কথা বলছেন সেটা পরিষ্কার না, অর্থাৎ পদ্ধতির বাস্তবায়ন কিভাবে হবে বা খুঁটিনাটি বোঝা যাচ্ছে না এটা বলা যেতে পারে এবং এটা যৌক্তিকও। কিন্তু 'তারা আসলে কীসের কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না' জাতীয় কথা জেনেশুনে, বর্তমান বাস্তবতায় বলা কিছুটা হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার প্রমান দেয়।

আর গত প্রায় চার দশকে এই প্রশ্ন নিয়ে ডজন ডজন বই আর হাজার হাজার প্রবন্ধ লেখা

হয়েছে, সেগুলোকে 'অন্য মাসলাকের লোকের লেখা' বলে পাত্তাই না দিয়ে অথবা খোঁজার চেষ্টাও না করে, পদ্ধতির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছি, এমন দাবি করাটাও সৎ মনে হয় না।

২) দ্বিতীয়ত, বাস্তবতা হল যখনই বিকল্পের কথা বলা হয়েছে তখন বিশাল একটা অংশ 'অনুপযুক্ত' কিংবা 'আম্রিকা সব দেখতেয়াছে, সব শুনতেয়াছে' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে বলেছেন। "জনাব! আমাদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা না করে নিজে একটি পারফেক্ট বিকল্প উপহার দিন। আর না হয় সমালোচনায় নিজের সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন।"

ব্যাপারটা যেন এমন যে যে আলেম কিংবা মুফতীর কাছে কোন মাসআলার এমন কোন বিকল্প নেই যেটা প্রশ্নকারীর কাছে আমলযোগ্য মনে হবে, তার কাছ থেকে ফতোয়া প্রদানের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া উচিৎ। এ ধরনের ভুয়া নীতি অনুসরণ করতে গেলে অনুযায়ী আমাদের মাদরাসাগুলো থেকে জারি করা অসংখ্য ফতোয়াই পরিত্যক্ত ঠেকে। দুনিয়ার কোন মুফতি এই মূলনীতির আওতা থেকে নিরাপদ না। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, কোন জিনিসকে হারাম ফতোয়ার দেয়ার আগে মুফতী সাহেবের দায়িত্ব হল এর বিকল্প বলে দেয়া। যদি তাঁরা কাছে বিকল্প না থাকে, তাহলে তিনি এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পারবেন না। যেন ইসলাম বাতিল চাহিদাকে খতম করতে না বরং সব কিছুর বিকল্প দেয়ার জন্য এসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত 'ইসলাম আনুষ্ঠানিকতা'-র ভুল ধারণার ফসল। অর্থাৎ (দ্বীন ও জীবনব্যবস্থা) হিসেবে ইসলামে না বোঝার কারণেই এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওজর নির্ভর এক আধুনিক পদ্ধতি জন্ম নিয়েছে। যা মূল শরীয়তের উপর আমল করার বদলে শুধু রুখসতের সবক দেয় এবং শরয়ী বাহানা খোঁজার মাধ্যমে এক হীন পথ তৈরি করে।

৩) এমনো বলা হয় যে গণতান্ত্রিক দেশে থাকেন, খান, ফেইসবুক চালান, এর বিকল্পও দিতে পারেন না, তাহলে বিরোধিতা করেন কেন?

কী বিচিত্র কথা বার্তা। যেন নিজের পছন্দমতো বিকল্প না পেলে কুফর কে কুফর বলা যাবে না, হারামকে হারাম বলা যাবে না! ইতিহাসে এমন অনেক নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) ছিলেন যাদের অনুসারীরা ছিল সংখ্যায় খুবই কম। তাঁরা নিজ উম্মতকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই ফিরে আসত না। এর মানে কি আম্বিয়ায়ে কেরাম বিকল্প পেশ করা ছাড়া খারাপ কাজ থেকে বারণ করে গর্হিত ও অনর্থক কাজ করে গেছেন? নাউযুবিল্লাহ। তাঁদের ওপর কি উম্মতের সুবিধার্থে হারাম চাহিদা পূরণের শরয়ী বিকল্প দেয়া আবশ্যিক ছিল? স্রষ্টা প্রদত্ত শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োগ করা, নবী-রাসূলগণের কাজ ছিল না। বরং তাঁদের মিশন ছিল ইসলামের অনুগত্য করার জন্য মানবজাতিকে পরিবর্তন করা। তাঁরা যুগের কারণে ইসলামে বদলাননি, যুগকে বদলেছেন।

সমস্ত উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত ফতোয়া হল, জুমার আজানের পর কেনাবেচা হারাম। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, জুমার আজানের পর বাজার-মার্কেট বন্ধ হয় না এবং মানুষ মনোযোগের সাথে কেনা-কাটায় ব্যস্ত থাকে। এখন কি উক্ত ফতোয়া অনর্থক হবে? এর থেকে রুজু করা

হবে? এমনিভাবে সমস্ত বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম নারীপুরুষের সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন। তবুও ক্রমাগত নতুন নতুন সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এখন কি একথা বলা হবে যে, উলামায়ে কেরাম যেহেতু বিকল্প স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি তৈরি করতে পারে নি তাই সহশিক্ষা হারামের ফতোয়া অনর্থক? বাস্তবায়ন করার শক্তি না থাকলে সঠিক হুকুম বলা যাবে না, এই মূলনীতি কোথায় আছে? বিকল্প পছন্দমতো বিকল্প না দিতে পারলে ভুলকে ভুল বলা যাবে না?

৪) কার্যকরী (পছন্দমতো) বিকল্পের দর্শন মূলত দাবি করে যে, প্রথমে বিকল্প পদ্ধতির একটি পরিপূর্ণ নকশা তৈরি করা হবে তারপর সেই নকশা পছন্দ হলে, আমরা সেটা গ্রহণ করবো। যেন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন বাসা বদল করার মতো কিছু। প্রথমে নতুন বাসা খুঁজে বের করো, তারপর আমরা এক বাসা ছেড়ে অন্যটায় গিয়ে উঠবো। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন কোনো বিচ্ছিন্ন one-off event বা ঘটনা না, বরং একটি প্রক্রিয়া। আপনি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে না ঢুকে কিভাবে আগাগোড়া খুটিনাটি সব জানতে চান আর কেনই বা আপনাকে জানানো হবে? আর এমন বিস্তারিত বিবরণ কে-ইবা বানিয়ে রাখে?

কুরআন ও হাদীস থাকার পর ও ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভব কেন হয়েছে? কারণ যদিও দিকনির্দেশনা পরিপূর্ণ কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্রমাগত এমন অনেক পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে উৎসের ওপর ভিত্তি করে সমাধান দিতে হয়। আদর্শের ও দিকনির্দেশনার প্রয়োগ কোন ক্ষেত্রে কীভাবে হবে সেটা ঠিক করতে হয়, ক্যাটাগরাইয করতে হয়। এটা তাত্ত্বিকভাবে হয় না, দিকনির্দেশনা ও আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে রিয়েলটাইমে হয়, অন দা গ্রাউন্ড হয়।

৫) সমাজ বিকল্পের দিকে কখন যাবে? যখন সমাজের মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধি আসবে যে যেটা আছে সেটাকে বদলাতে হবে, একটা অন্য ব্যবস্থায় যেতে হবে। মানুষের মধ্যে যখন বিকল্পের চাহিদা তৈরি হবে। আর মানুষের মধ্য চাহিদার তীব্রতার ভিত্তি হলো, বিদ্যমান ব্যবস্থার ব্যাপারে মানুষ কতোটাঅতৃপ্ত এবং তাঁরা কতো শক্তভাবে এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি চায়। বিকল্পের সুযোগ তখনই আসবে যখন সমাজের একটি প্রভাবশালী কিংবা উল্লেখযোগ্যঅংশ বিদ্যমান ব্যবস্থার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনি যদি সমাজের মানুষকে বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে অসন্তুষ্ট হতে না দিয়ে, বিভিন্ন ধরনের status quo কে জাস্টিফাই করতে থাকেন, চলমান ব্যবস্থাকেই জোর করে বৈধতা দিতে থাকেন, দশকের পর দশক এভাবে তাদের বুঝ দিতে থাকেন যেভাবে চলছে চলুক সমস্যা নেই, বিকল্প দরকার এই বোধও যদি আপনি মানুষের তৈরি না করেন তাহলে সত্যিকারের বিকল্পের আসার প্রেক্ষাপট কিভাবে তৈরি হবে? আপনি যদি ক্রমাগত জাহিলিয়্যাতের ইসলামীকরন করে যান, এবং একেই ইসলাম বলে চালিয়ে দেন, তাহলে কিভাবে তাদের মধ্যে সত্যিকারের ইসলাম আনার চেতনা ও দাবি তৈরি হবে?

সুতরাং যেই বিষয়ের অনুপস্থিতিকে দলিল বানিয়ে ভোট ও নির্বাচনের বৈধতাদানকারীর প্রতিপক্ষকে চুপ করানোর চেষ্টা করছেন, সেটার উপস্থিতি কিংবা অর্জন নির্ভর করে সমাজের

একটি প্রভাবশালী অংশ সেটা কামনা করার ওপর। কেননা এটা হতে পারে না যে, সমাজে কোনো বস্তুর একেবারেই চাহিদা নেই, অথচ তার উৎপাদনে ভীড় লেগে যাবে। কোন কিছুর অস্তিত্বের জন্য যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন, সেটা তখনই জোরদার হবে যখন সমাজ এই বিকল্পকে নিজেদের জন্য আবশ্যিক মনে করবে। এসব আজীব কথাবার্তা যে - বাতিলকে বাতিল বলো না। তাকে চলতে দাও এবং বাতিলের সরানোরআওয়াজও তুলবে না।
৬) বিকল্প কী হবে তার আংশিক আলোচনা আল-কাউসারের লেখাতেই উঠে এসেছে।
'আমাদের গুনাহ-অপকর্ম, দ্বীন-শরীয়তের প্রতি উদাসীনতা, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অনুপস্থিতি এবং তাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দেওয়া ও সহীহ মানসিকতা তৈরি করার ব্যাপারে আমাদের আলেমসমাজ ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের ব্যর্থতা আমাদেরকে এ অধঃপতনে নামিয়েছে। যে পর্যন্ত সাধারণ লোকজনের একটি বিশাল অংশকে দ্বীনি শিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতার সৃষ্টি না করা যাবে এবং চিন্তা ও বুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে গণজারণ ও বিপ্লবের সূচনা না করা যাবে সে পর্যন্ত আমাদেরকে গণতন্ত্রের এই তেতো শরবত পান করেই যেতে হবে।'
যে সময়, শ্রম, অর্থ ও মানুষকে এসব নির্বাচন ও ভোটের পেছনে লাগানো হচ্ছে, যেসমস্ত ইলমসম্পন্ন ব্যাক্তিরা এই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গঠন আর রাজনীতির পেছনে নিজেদের মেধা, সময় ও ইলমকে খরচ করছেন, তারা যদি এই সবকিছু গণতন্ত্রের ব্যাপারে এবং ইসলামী শাসনের আবশ্যিকতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা অজ্ঞতাকে দূর করা, তাদের মধ্যে সহীহ মানসিকতা তৈরি করা, সাধারণ লোকজনের একটি বিশাল অংশকে দ্বীনি শিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতার সৃষ্টি করা, এবং চিন্তা ও বুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে গণজারণ ও বিপ্লবের সূচনা করার জন্য কাজে লাগাতেন – তাহলে নিশ্চিতভাবেই মতের পার্থক্য হলেও এই তিক্ত তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হতো না। কারণ সাধারণ মানুষ ভোট দেয়াকে দ্বীনি দায়িত্ব মনে করার বদলে বিকল্প খোজাকে দ্বীনি দায়িত্ব মনে করতো। আর সহিহ মানসিকতা সম্পন্ন লোকের এই বিকল্প খুঁজে পেতে কুরআনের চেয়ে বেশি দূরে খুঁজতে হতো না।

উপসংহার

ইসলাম মানব জীবনের সফলতার জন্য একটি নিজস্ব, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ ধারণা দেয়। আর ইসলামী জীবনের বিশেষ ধারা, দাবি ও চাহিদা আছে। অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ মেনে নিতেও ইসলাম রাজি না। ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই যেকোন যুগের বাতিল চাহিদাগুলোর ব্যাপারে ইসলাম তার অনুসারীদের ধৈর্য্য ধরে নিবৃত্ত হবার শিক্ষা দেয়। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট বাতিল চাহিদাগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিয়ে করার সক্ষমতা না থাকা অবস্থায় ইসলাম আমাদের মুত'আ কিংবা যিনা করার শরীয়াহসম্মত পদ্ধতি খুঁজে বের করতে বলে না, বরং রোজারাখা এবং ধৈর্য ধরার নির্দেশ দেয়।
প্রকৃত সমাধান হলো, এই ব্যবস্থা থেকে পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া এবং একে কুফর

তথা জাহিলিয়্যাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। এই কুফর ও জাহিলিয়্যাহকে খতম করার জন্য অবস্থা ও মূলনীতির অনুযায়ী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সাথে সাথে মানুষকেও এর জন্য প্রস্তুত করা। এটা না করে জাহিলিয়্যাহর ইসলামীকরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে বিকল্প দিতে দিতে একসময় অবধারিতভাবেই দ্বীনের রূপ পাল্টে যাবে।

যেমনটা উস্তাদ সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন -

"আল্লাহ্*র নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি হল হাকিমিয়্যাহ। যখনই কেউ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করে, তখনই সে নিজেকে আল্লাহর বদলে এমন আরেক প্রভুর ভূমিকাতে বসিয়ে নেয় যার আইনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়। আর যারা এই আইন প্রণেতা বা আইন প্রণেতাগণের আনুগত্য করে, তারা আল্লাহ্*র গোলামের পরিবর্তে আইন প্রণেতাদের গোলামে পরিণত হয়। তারা অনুসরণ করে আইন প্রণেতাদের সৃষ্ট দ্বীনের, আল্লাহর দ্বীন ইসলামের না। জেনে রাখুন আমার প্রিয় ভাইরা, এটা আক্বিদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। এটা হল উলুহিয়্যাহ (একমাত্র আল্লাহ্*কে ইলাহ/উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা) এবং 'উবুদিয়্যাহর (একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব) প্রশ্ন। এটা হল ঈমান ও কুফরের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাহ এবং ঈমানের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাহ কোন নির্দিষ্ট সময় বা যুগ না, জাহিলিয়্যাহ হল একটি অবস্থা।"[সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ - ফী যিলালিল ক্বুর'আন]

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বাস্তবতা বুঝার তাওফীক দান করুন। আমিন।

--

---

*সূরা নাহলের ১০৬ নং আয়াত এবং আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনা থেকে কি বলপ্রয়োগের কারনে কুফর কাজ করা ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহন ও ভোট দেয়ার দলিল দেয়া যায়?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

مَن كَفَرَ بِاللَّـهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّـهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। (নাহল, ১০৬)

প্রথমত, এই উদাহরন মুখে কুফরি উচ্চারণের সাথে অর্থাৎ কথার সাথে সম্পর্কিত। কাজের সাথে না। বলপ্রয়োগের কারণে কুফর কাজ করার দলীল এখান থেকে সরাসরি পাওয়া যায় না। বরং অনেক ফকীহ এমনও বলেছেন যে কুফরীর চেয়ে কম কাজের ক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগের ওজর গ্রহণযোগ্য না। যেমন অনেকে বলেছেন যিনার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ গ্রহণযোগ্য ওজর না।

দ্বিতীয়ত, ইকরাহ এর সীমারেখা স্পষ্ট করতে হবে, এবং এটা ফকীহগণ স্পষ্ট করেছেন - এমন বলপ্রয়োগ যার কারণে প্রাণনাশের বা অঙ্গহানীর আশঙ্কা থাকে অথবা এমন মারাত্মক নির্যাতিত

হওয়ার আশঙ্কা থাকে যাতে মৃত্যু বা অঙ্গহানি হতে পারে। এছাড়া বলপ্রয়োগ গ্রহনযোগ্য ওজর হবার আরো অনেক শর্ত বিভিন্ন মাযহাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভোট বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্লিয়ারলি এই পর্যায়ে ব্যাপারটা যাচ্ছে না। যেমনটা আগে বলা হয়েছে।
তৃতীয়ত, এই আয়াতে এবং আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কথা এসেছে। এই পুরো দাবির সম্পর্ক বলপ্রয়োগে বাধ্য করার সাথে। ভোট আর নির্বাচনের সাথে বলপ্রয়োগের ব্যাপারটা কিভাবে আসছে? আপনাকে-আমাকে, ১০ কোটী ৩০ লাখ ভোটারকে, নিজে নিজে মহাসোমারোহে মনোনয়নপত্র দিয়ে আসা লোককে কে বলপ্রয়োগে, প্রান কিংবা অঙ্গহানির আশংকায় ফেলে ভোট দিতে কিংবা নির্বাচন করতে বাধ্য করেছে? এখানে কিভাবে এই দলীল খাটানো যায়? যদি কেউ আসলেই ভোট না দিলে মারা যাবে (!) বা নির্বাচন না করলে মারা যাবে এমন অবস্থায় থেকে থাকে তবে তার কথা ভিন্ন হলেও হতে পারেও।
কাজেই গণতন্ত্র কুফরি ও শিরক মনে করলে এক্সট্রিম কিছু কেইস ছাড়া মন্দের ভালো – এর কথা বলে ভোট-নির্বাচনকে বৈধতা দেয়া যায় না। এবং এই আয়াত ও ঘটনাকে দলীল হিসবাএ ব্যবহার করা যায় না।